মানুষ

মানুষ/মওলানা আবুল কালাম আজাদ

মানুষ

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
অনুবাদ : তাজা কলম

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অনুবাদ ঃ তাজা কলম

ইসাকেডা প্রকাশনা ২৯
ইফা প্রকাশনা ৪১৫

প্রকাশক ঃ
মুহম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ পাহলোয়ান
সহকারী পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ
বায়তুল মুকাররাম (তেতলা), ঢাকা-২

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মে ১৯৮০
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ ঃ রজব ১৪০০

প্রচ্ছদ ঃ কাজী আসাদুজ্জামান

মুদ্রক ঃ
মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪, শিরিশ দাস লেন
ঢাকা-১

মূল্য ঃ এক টাকা মাত্র

MANUSH (The Man) ঃ written by Maulana Abul
Azad, translated by Taza Qalam and published by I
Cultural Centre, Dacca Division, Dacca-2, Bang
Price ঃ Taka One only.

www.pathagar.com

আমাদের কথা

মানুষ কি? কি তার পরিচয়? কোত্থেকে সে এসেছে? কোথায় সে ফিরে যাবে? এ-সব প্রশ্নের জবাব প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দর্শন দিয়েছে বিভিন্নভাবে। প্রাচ্য দর্শন মানুষকে মনোজগতের এমন এক নিঃসীম নভোনীলায় নিয়ে যায় যেখানে সে পার্থিব বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। এর বিপরীতে পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শন মানুষকে তার আধ্যাত্মিক বুনিয়াদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমন এক নিরেট বস্তুতান্ত্রিকতার গহ্বরে নিক্ষেপ করে, যেখানে মানুষ নিজেকে আত্মঘাতী যন্ত্রে পরিণত করে বসে। প্রখ্যাত মনীষী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মনে করেন, এই দুই বিপরীত দর্শনের সমন্বয়েই হয়ত একদিন ধুলার ধরায় মানুষের স্বর্গ রচনা সম্ভব হবে। তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইসলামী দর্শনেই রয়েছে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনা। কারণ ইসলাম মানুষকে যেমন আল্লাহর সৃষ্টি ঘোষণা করে বস্তুবাদী বল্গাহীনতার নিগড় থেকে মুক্তি দিয়েছে, তেমনি তাকে আশরাফুল মখলুকাত আখ্যা দিয়ে এবং গোটা সৃষ্টি-মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট—এ ঘোষণা দিয়ে বিজ্ঞান-সাধনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

মাওলানা আজাদের ক্ষুদ্র অথচ দার্শনিকতাপূর্ণ এ রচনা ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-র পক্ষ থেকে প্রকাশ করতে পেরে আমরা বিশেষ গৌরব বোধ করছি। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা ।। ১৭. ৫. ৮০.

আবদুল গফুর
আবাসিক পরিচালক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিগত ছয় হাজার বছর বা তদধিক কালে মানুষ তার আদিম সমাজ-জীবন ছেড়ে সভ্যতার পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এই সুদীর্ঘ কাল-পরিক্রমায় সে পার হয়ে এসেছে বহু গিরিদরিবন, মরু-প্রান্তর, জয় করে নিয়েছে জড় ও জীব জগতের বহু দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। নানারূপ ভাগ্য বিপর্যয় সত্ত্বেও তার জয়যাত্রা প্রায় অব্যাহত বেগেই চলেছে। তার যাত্রা-পথের দু'ধারে প্রকৃতির বহু দুর্জ্ঞেয় রহস্যই একে একে অনাবৃত হয়ে পড়েছে। রহস্যের যে গোপন আবরণে প্রকৃতি এখনও তার মুখাবয়ব ঢেকে রেখেছে, সেও আজ মানুষের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে খসে খসে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে মানুষের বিস্ময়কর সাফল্য ও অব্যাহত অগ্রগতি সত্ত্বেও কি আজ আমরা জোর গলায় বলতে পারি যে, মানুষ তার আপন অন্তরলোকের যথার্থ পরিচয় পেয়েছে। সুদীর্ঘ ছয় হাজার বছর পরম সত্যের অনুধ্যান করেও সত্যান্বেষী মানুষ কি বলতে পারে ঃ সে আজ নিজেকে আপন যথার্থ স্বরূপে চিনতে পেরেছে ?

না, পারে না ! দীর্ঘ দিনের সাধনায় মানুষ সভ্যতার যে মুকুরখানি গড়ে তুলেছে, তাতে একটি বস্তু ছাড়া দুনিয়ার তাবৎ বস্তুরই রং ও রূপ ধরা পড়ে।

এবং সে বস্তুটি হচ্ছে তার আপন স্বরূপ। স্বীয় অন্তরাত্মার সঠিক পরিচয় মানুষ পেল না কোন দিন। বিশ্ব-রহস্যের চেয়ে তার আত্ম-রহস্যই মানুষের কাছে অধিকতর দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। অবশ্য প্রায় তিন হাজার বছর ধরে দার্শনিক পন্ডিতেরা এ প্রশ্নের জবাব দিতে বরাবর চেষ্টা করেছেন,

ঃ মানুষ কি ও কেন ?

ঃ মানুষ কোথা হতে আসে আর যায়ইবা কোথায় !

কিন্তু এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব আজো কেউ দিতে পারেন নি।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষ যদি নিজেকে নিজে না চিনতে পারে, যদি না বুঝতে পারে এ বিরাট বিশ্বের বিপুল পরিসরে কোন্‌খানে তার স্থান, তাহলে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুধাবন তার পক্ষে অসম্ভব।

বস্তুতঃ এ হচ্ছে একটা মৌলিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষী-ব্যক্তিরা কিভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

www.pathagar.com

গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে, এক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বলতে উভয় ভূখন্ডের চিন্তার কতিপয় বৈশিষ্ট্যই বুঝায়। এ-কথার অর্থ এ নয় বা এ হতেই পারে না যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তারীতিতেই কোন মিল নেই। চিন্তা ও যুক্তির ক্ষেত্রে দুনিয়াজোড়া মানুষ একই রীতি অনুসরণ করে চলে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এক ও অভিন্ন। মানুষের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বেদনার অনুভূতি সর্বত্রই প্রায় এক।

দুনিয়ার সর্বত্র একই রকম ঘটনা মানুষের মনে একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অতএব এটা স্বাভাবিক যে জগত ও জীবন সম্পর্কে মানুষের চিন্তার ধাঁচ সর্বত্র মোটামুটি এক। সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্য সম্পর্কে তাদের ভয়-ভাবনাও প্রায় তাই। প্রাচীন গ্রীকবাসী যেরূপ ভয় ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে অলিম্পিয়া পর্বতের শিখর পানে চেয়ে চেয়ে দেখত, হিমালয়ের উপত্যকায় ধ্যানমগ্ন আর্য ঋষিদের মনেও চিররহস্যাবৃত হিমগিরিশৃঙ্গ দেখে দেখে ঠিক তেমন অনুভূতিই জাগত।

নানা বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সমাধানের কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের মন দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন পথে বিচরণ করে। পথের এ পার্থক্য না থাকলেও একই সমস্যা ও এর সমাধানের বিভিন্ন দিক দেশ-কাল ভেদে মানুষের মনে বিভিন্ন রূপ গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

কোন দুটি ঘটনাই প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন নয়। অতএব, অনিবার্য কারণেই একই সমস্যার বিভিন্ন দিক দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্নরূপ গুরুত্ব লাভ করবে, এটা স্বাভাবিক। গুরুত্ব আরোপের তারতম্যকেই আমরা চিন্তাক্ষেত্রে কোন দেশ বা জাতির বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেই। এই আলোকেই এবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তা-রীতির পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাচ্ছে।

এ-কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, কোন সমস্যার সমাধান রঙ ও রেখায় অভিন্ন হলেও এর রং-এর খেলায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে বলেই আমরা কোনটাকে বলি প্রাচ্যরীতি আর কোনটাকে বলি পাশ্চাত্যরীতি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তাধারায় বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের আদিম পর্যায় থেকে প্রাচীন গ্রীক, চীন ও ভারতবর্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পার্থক্য স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষীয় দার্শনিক চিন্তায় বলা যায়, মানুষের মনোজগতের অভিজ্ঞতার উপর সমধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভারতবর্ষীয় দার্শনিকরা মানুষের অন্তরাত্মার স্বরূপ অনুধাবনেরই চেষ্টা করছেন এবং এ ব্যাপারে তারা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি, বুদ্ধি এমনকি বিবেক-বুদ্ধিকেও পেছনে ফেলে মানবাত্মার

www.pathagar.com

সাথে এক গভীর রহস্যাবৃত পরম সত্তার অভেদ প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

পক্ষান্তরে গ্রীক দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ। বহির্বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়ই ছিল তাঁদের প্রধান উপজীব্য। ভারতীয় দর্শনের তুলনায় গ্রীক দর্শন বহুলাংশে বহির্মুখীন বলা যায়।

অপরদিকে দেখা যায়, মানবাত্মার স্বরূপ অথবা বহির্বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক—এ বিষয়ে চীনা দার্শনিকদের কোন শিরঃপীড়া নেই। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়ই চীনা দর্শনের প্রধান উপজীব্য।

লক্ষ্যের এই পার্থক্য পরবর্তী যুগে উল্লিখিত প্রতিটি দেশের দার্শনিক চিন্তা বিকাশের পথে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই কারণে ওসব দেশের অধিবাসীদের মনে মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে গভীর প্রভেদ বিদ্যমান।

মানুষ সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের দৃষ্টি ছিল বহির্মুখীন। তাই দেখা যায়, আদিমকাল থেকেই গ্রীক দর্শনে মানুষের স্বরূপের চেয়ে মানুষের আচার-আচরণ, অর্থাৎ "মানুষ কি"—এ প্রশ্নের চেয়ে—"মানুষ কি করে"—ঐ সমস্যাই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। এ-কথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, প্রাথমিক যুগে কোন কোন গ্রীক দার্শনিক মানুষকে একটা আধ্যাত্মিক সত্তারূপেই চিন্তা করেছেন এবং সম্ভবতঃ প্লেটোর যুগ পর্যন্ত এই-ই ছিল গ্রীক দর্শনের মূল সুর। কিন্তু এরিস্টটলের আবির্ভাবের পর-পরই চিন্তার মোড় ঘুরে গেল এবং মানবিক সত্তার চেয়ে জাগতিক ব্যাপারে মানুষের আচার-আচরণই সর্বাধিক প্রাধান্য পেতে লাগল।

এরিস্টটল সর্বপ্রথম মানুষকে যুক্তিবাদী দ্বিপদ প্রাণী বলে অভিহিত করেন। তাঁর প্রভাবে দর্শন হয়ে ওঠে অধিকতর প্রত্যক্ষ। কালক্রমে এই প্রত্যক্ষ, ব্যবহারিক ও বিজ্ঞানধর্মী মনোভঙ্গি য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। সে-মতে মানুষ ও পশুর প্রভেদ হচ্ছে মানুষের বিবেকবুদ্ধি। এই বিবেকবুদ্ধির বলেই মানুষ তার আদিম পাশবসত্তার বহু ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পেরেছে।

তা সত্ত্বেও বলা যায়, মানুষ বস্তুতঃ ও মুখ্যতঃ প্রগতিশীল জীবই রয়ে গেছে। এই চিন্তাধারার অনুপম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় জার্মান দার্শনিক রিহল্-এর লেখায়। মানুষ পশু থেকে সম্ভূত এ মতবাদ স্বীকার করেও তিনি বলেনঃ ক্রমবিকাশের পথে মানুষ আজ এমন এক মার্গে পেঁাছেছে, যেখান থেকে তাঁর দৃষ্টি ঊর্ধ্বপানে নিবদ্ধ

www.pathagar.com

রাখতেই সে বাধ্য। নীচের দিকে সে দৃষ্টি ফেরাতেই পারে না। বস্তুজগতে একমাত্র মানুষই শির-দাঁড়া খাড়া করে সোজা দাঁড়াতে পারে এবং ততদিনই সে এমনিভাবে দাঁড়াতে পারবে, যতদিন সে তার দৃষ্টি ঊর্ধ্বলোক কোন মহান লক্ষ্যের পানে নিবদ্ধ রাখবে। ঊর্ধ্বলোকের মহান লক্ষ্যবস্তুই ঈশ্বরানুভূতি।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি

একথা সত্য যে য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় খৃস্টধর্ম ও প্লেটোর দার্শনিক ঐতিহ্য বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই কারণেই দেখা যায়, মধ্যযুগীয় সূক্ষ্মদর্শী 'স্কোলাস্টিক' দার্শনিকেরা যত না দার্শনিক তার চেয়ে বেশী ধর্মবেত্তা। এমন কি, আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তাধারার গভীরেও এক প্রবল ধর্মীয় আদর্শবাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য আধুনিক যুগের শুরু থেকেই সে সুর ক্রমেই বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আড়ালে চাপা পড়ে যেতে থাকে।

সপ্তদশ শতক থেকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সূচনা, এবং এর ফলে মানুষ ক্রমেই প্রকৃতির উপর জয়ী হতে থাকে। বিজ্ঞানের চোখধাঁধানো সাফল্যে বিস্ময়-বিমূঢ় পাশ্চাত্যবাসীর মনে বিজ্ঞানের অমোঘ শক্তি সম্পর্কে একটা বিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ওরা বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চায়। মানুষকেও ওরা ধরে নিল, জাগতিক বস্তুনিচয়ের মাঝে অন্যতম একটি বস্তু হিসেবেই। কালক্রমে বিজ্ঞাননির্ভর বস্তুবাদ হয়ে দাঁড়াল ওদের একমাত্র উপজীব্য এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এ মতবাদ চরম পরিণতি লাভ করল।

ডারউইন প্রমাণ করতে চাইলেনঃ মানুষ পশু থেকে সম্ভূত।

মার্কস বললেনঃ মানুষের মানসিকতা গড়ে ওঠে প্রধানতঃ তার আধিভৌতিক প্রতিবেষ্টনের ফলে। বিশ শতকের প্রারম্ভে ফ্রয়েড আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করলেনঃ মানুষ পশু থেকে সম্ভূত তো বটেই। কিন্তু তারও বেশী, তার মানসিকতায় পূর্বপুরুষ পশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিছু-না-কিছু বিদ্যমান থাকে।

পক্ষান্তরে মানুষ প্রগতিশীল জীব—এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা প্রত্যয়ের সন্ধান আমরা পাই প্রাচ্য দর্শনে। আদিম কাল থেকেই প্রাচ্য জগতে মানুষের সহজাত আধ্যাত্মিকতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপ চিন্তার ফলেই উদ্ভব

www.pathagar.com

হয়েছে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বেদান্ত দর্শন ও আরবের সুফীবাদ এবং এ ধারণামূলেই গড়ে উঠেছে প্রাচ্যের সামগ্রিক মেজাজ। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। প্রাচ্যে দর্শনের মূল কথা হচ্ছে এই ঃ মানুষ শুধুমাত্র জীবদেহী এহেন ধারণা পোষণ করে কোন মতেই মানুষের স্বরূপ বোঝা যায় না। মানুষের স্বরূপ তখনই উপলব্ধ হয় যখন আমরা ধরে নেই যে মানুষ আল্লাহ থেকে সম্ভূত।

প্রাচ্য দর্শন অদ্বৈতবাদের লক্ষণাক্রান্ত। ভারতবর্ষীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখারই অভিমত ঃ "সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" সকল বস্তুর মাঝেই ব্রহ্ম প্রকাশমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর বিশ্বাস মানুষ আসলে অনন্য, কেননা তার মাঝেই হয়েছে আল্লাহ্‌র পরম প্রকাশ।

গীতার ভাষায় ঃ

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য
বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌,
ত্বমব্যয়ং শাস্বত ধর্ম-গোপ্তা সনাতনস্তং
পুরুষো মতি মে।।

তোমাকে আমি জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর রূপ, এই জগতের অন্তিম আধার সনাতন ধর্মের অবিনাশী রক্ষক ও সনাতন পুরুষ বলিয়া মানি।। [১১—১৮]

ঠিক তেমনি সুফী মতে ঃ

"মানুষ কুলহীন সমুদ্রের একটা তরঙ্গ,সে সমুদ্র হচ্ছে আল্লাহ্‌। মানুষ সূর্যের একটা কিরণ-রশ্মি, সে সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌। অজ্ঞানতার আবরণে দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে বলেই মানুষ নিজেকে পৃথক সত্তা বলে মনে করে। সে আবরণ যেই খসে পড়ে অমনি সব ব্যবধান দূর হয়ে যায় এবং মানুষ ঠিক বুঝতে পারে, পরমাত্মারূপী মহাসমুদ্রে সে একটা ক্ষীণ বুদ্বুদ মাত্র।"

প্রাচ্য দর্শনে মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রত্যয় ফুটে উঠেছে তাতে দেখা যায় সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মানুষ শ্রেষ্ঠ—শুধু তাই নয়, স্বভাবের দিক দিয়েও অপরাপর সৃষ্ট বস্তু থেকে সে সম্পূর্ণ অভিন্ন :

সমপর্যায়ের জীবদেহীদের মাঝে তার আসন সর্বোচ্চ, শুধু তাই নয়। তার সত্তা ও বিভূতি অপরাপরের চেয়ে উচ্চ মার্গের।

প্রগতিশীল জীবই নয় সে শুধু, স্রষ্টার রং-এ সে অনুরঞ্জিত।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ, তার স্বভাব এমন মহৎ যে মানববুদ্ধিতে এর চেয়ে মহত্তর কোন কিছু ধারণাই করা যায় না।

ছান্দগ্যোপনিষদের ভাষায় ঃ "সে হচ্ছে পরম সত্তা, সে হচ্ছে আত্মা, এবং তত্ত্বমসি—সে তো তুমি।"

আরবীতেও এ তত্ত্বটা প্রকাশ পেয়েছে আরো সুন্দরভাবে ঃ 'মান আ'রাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।'

নিজেকে যে চিনেছে সে আল্লাহ্‌কেও চিনেছে।

এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই, মানুষ কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তা নয়, বরং তার মাঝে সমগ্র জগৎ বিধৃত।

গীতার ভাষায় ঃ

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎসং পশ্যাদ
সচরাচরম,
মম দেহে গুড়-কেশ। যাচ্চান্যদ
দ্রষ্টু মিচ্ছসি

হে গুড়াকেশ। এইখানে আমার শরীরে একরূপ স্থিত স্থাবর ও জঙ্গম যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা আজ দেখ। [১১—৭]

ওই একই কথার প্রতিধ্বনি পাই আরবী সুফী কবির কবিতায় ঃ

ওয়াতাহছাব আন্নাকা জারমুম সগীর,
ওয়াফিকা আনতাভী আলেমুন আকবারর।

"নিজেকে তুমি ক্ষুদ্র মনে কর। তুমি জান না, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও বৃহত্তর জগত তোমার মাঝে বিধৃত।"

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, মানুষ সম্পর্কে এর চেয়ে আর কোন মহত্তর ধারণা হতেই পারে না। মানুষের সব ধ্যান-ধারণার চরম আল্লাহ্‌। প্রাচ্য দর্শনে মানুষকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মানুষকে দেবত্বের পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এর নির্গলিত অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ই মানুষের গতির চরম। একদিন তাকে মূলের পানে ফিরে যেতেই হবে। এবং এই হিসেবে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত—সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ।

॥ ২ ॥

এ পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের দৃষ্টিতে মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করা গেল। এবার ইহুদী ও খৃস্ট ধর্মের আলোকে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

www.pathagar.com

বাইবেলের আদি পুস্তকে বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার আপন স্বরূপে।"

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়ঃ মানুষ আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত।

খৃস্ট ধর্মও এমন একটা গভীর আধ্যাত্মিক মরমীবাদের লক্ষণাক্রান্ত যা চরম ভোগবাদের পথে প্রবল অন্তরায় স্বরূপ।

ইসলাম ধর্মেও অনুরূপ ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ কুরআন এক্ষেত্রে আরো এক কদম অগ্রসর। কুরআনের ভাষায়, মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি।

আমাদের সৃষ্টি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেনঃ "ইন্নী জায়েলুন ফিল আরদি খালীফাতান"—দুনিয়ায় আমি খলীফা সৃষ্টি করতে চাই। (২ঃ ২৯)

"মানুষ আল্লাহ্র খলীফা"—এ প্রত্যয় আরব-দার্শনিক চিন্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। দুনিয়ায় আল্লাহ্র খলীফা হিসেবে আল্লাহ্র সাথে মানুষের অতি নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এই কারণেই সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মানুষ শ্রেষ্ঠ তো বটেই, পরন্তু অপরাপর সৃষ্টিজীব, এমন কি, প্রাকৃতিক শক্তির উপরও মানুষ জয়ী।

কুরআন বারংবার ঘোষণা করেছেনঃ ওরা সাখখারা লাকুম মাফিস্সা-মাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদি জামিয়াল মিনহু।

স্বর্গে-মর্তে যা কিছু আছে, সব মানুষের আজ্ঞাধীন (৪৫ঃ ১৩)

এ-কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, আরব দার্শনিকদের মধ্যে অনেকের চিন্তাধারায় এরিস্টটলের গভীর প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা এরিস্টটলীয় দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন মানুষের খিলাফতের আলোকেই। ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ তত্ত্বের দিক থেকে যদিও এরিস্টটল অনুসারী তবু ইসলামের আধ্যাত্মিকতার সাথে গভীর পরিচয় ছিল বলে এঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ যেহেতু আল্লাহ্র গুণে-গুণান্বিত, তাই জ্ঞান ও শক্তির রাজ্যে ঊর্ধ্বারোহণে মানুষের সম্ভাবনার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল-গাযালী, আর-রাজী, আর-রাগীব ইস্পাহানী এবং অন্যান্য আরও অনেকে তাদের বিভিন্ন দার্শনিক রচনায় এ ধারণার পরিপুষ্টি সাধন করে গিয়েছেন।

অবশ্য একথাও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বেদান্ত ও সুফী দর্শনে মানুষের অশেষ মর্যাদার স্বীকৃতি যদিও রয়েছে, তবু এর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগও নেহায়েৎ অমূলক নয় যে, এতে একদিকে যেমন মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার কথা স্বীকৃত, অপরদিকে তেমনি মানুষের শক্তি কেমন যেন এক সূক্ষ্ম অদৃষ্টের বন্ধনে আবদ্ধ, এমত একটা প্রবণতাও লক্ষণীয়। এই আপাতঃবৈষম্যের ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে মানুষ ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য সম্পর্কের প্রত্যয়ে। মানুষ যেহেতু আল্লাহ্‌র ইচ্ছারই অভিব্যক্তি, অতএব, মানুষের সর্বকর্মের মূল প্রেরণা হচ্ছে আল্লাহ্‌। এখানে যা কিছু ঘটে সে আল্লাহ্‌রই অভিপ্রায়ে। এপথে আর এক কদম অগ্রসর হলেই বলতে হয়, মানুষ অদৃষ্টের হাতের ক্রীড়নক মাত্র।

অনেকে বলেনঃ বেদান্ত বা সুফী মতে সাধনাবলে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ আধ্যাত্মিকতার চরম মার্গে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে সে সাধনা মানুষের অগ্রগতির পথে এক প্রতিবন্ধক স্বরূপ। আল্লাহ্‌ ও মানুষের পরম নৈকট্য সম্পর্কের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে জাগতিক দুঃখ-দুর্দৈব সম্বন্ধে সমাজমন অপেক্ষাকৃত নিস্পৃহ হয়ে ওঠে ; কেননা, দুঃখ-বেদনাই তখন মায়ার খেলা বলে প্রতিভাত হয়। তাই দেখা যায়, সামাজিক অসাচ্ছন্দ্য ও অসুবিধার মূল কারণ অনুধাবন ও অপসারণে প্রাচ্য সমাজমানস প্রায়শঃ উদাসীন। এই কারণেই অধুনা কোন কোন দার্শনিক 'অদৃষ্টবাদ' বাদ দিয়ে বেদান্ত-দর্শন পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেছেন।

মানুষ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণার মাঝেও দৃশ্যতঃ এমনি একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। একদিকে জড়বাদী দর্শন গোড়াতেই এ ধারণা জন্মায় যে, জীবন সম্পর্কে এর দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয়তাবাদী। বস্তুজগতের অপরাপর ক্ষেত্রে যেমন কার্যকারণপরম্পরা বিদ্যমান, তেমনি মানুষের কর্মক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম ক্রিয়াশীল। বিহেভিয়ারিস্ট দার্শনিকদের মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যয়ে এর পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে এহেন নিশ্চয়তাবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে পাশ্চাত্য মানসেই এবং এর বিরুদ্ধে এরা প্রতিবাদও জানিয়েছে খুব জোরেশোরে।

o o o

প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তার গভীরে মানুষ সম্পর্কে যে দুইটি বিভিন্ন প্রত্যয় ক্রিয়াশীল, কী উপায়ে এর সমন্বয় সাধন করা যায়, এটা-ই হচ্ছে আজকের প্রশ্ন। প্রাচ্য দর্শনের মানুষের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্য দর্শনে মানবিক প্রগতি এ দু'য়ের সমন্বয়ে মানুষের সামনে বিপুল সম্ভাবনাময় একটা পথ খুলে যেতে পারে,

www.pathagar.com

যাতে করে বিজ্ঞানের অপব্যবহার না করেও মানুষ উন্নতির চরম মার্গে পৌঁছে যেতে পারবে। প্রাচ্য দর্শনের মানবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ—এই প্রত্যয় অদৃষ্টবাদের যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে তার থেকেও হয়তো মুক্তি পাওয়া যাবে।

প্রাচ্য দর্শনে মানুষের মর্যাদা ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক প্রগতি, এতদুভয় ধারণা সুসমঞ্জস; এদের মাঝে বৈজ্ঞানিক উন্নতির অপরিসীম সম্ভাবনাময় একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যারও সন্ধান পাওয়া যায়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, মানুষ প্রগতিশীল জীব বৈ কিছু নয়, তা হলে তার প্রগতির সীমাবদ্ধতার কথাও মেনে নিতেই হয়। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র অসীমত্বের প্রতিফলন রয়েছে, তা হলে মানুষের প্রগতি ও সম্ভাবনার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এই প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞান তখন একের পর এক সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্যসমূহ অধিগত করে মানব মনের সব দ্বিধা-সন্দেহ নিরসন করতে সক্ষম হবে।

তা ছাড়াও মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অসীম গুরুত্ব আরোপের আরও একটা জোরালো যুক্তি রয়েছে।

বিজ্ঞান মূলতঃ নিরপেক্ষ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জীয়ন-কাঠি শেষে মরণ-কাঠি হয়ে দাঁড়াতে পারে। সব কিছু নির্ভর করে মানুষের খোশ-খেয়ালের উপর—তাকে শান্তির কাজ ব্যবহার করে একটা শান্তিময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে, না কি জগৎজোড়া এক লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে নিজেদের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করবে।

মানুষ প্রগতিশীল জীব, শুধু এই যদি আমরা ধরে নেই, তাহলে মানুষের লুপ্ত পাশববৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশ্যে তার হীন স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে বিজ্ঞানের অপব্যবহার করার পথে কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না।

পক্ষান্তরে মানুষ যদি নিজকে আল্লাহ্‌র খলীফা বলে মনে করে, তাহলে আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত পথে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করতে সে উদ্বুদ্ধ হবে। সে পথ শান্তির, সে পথ মানুষের প্রতি মানুষের শুভেচ্ছার।

বক্ষ্যমান আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণা পরস্পর পরিপূরক।

একদিকে এরা গেয়েছে মানবাত্মার জয়গান, অপরদিকে ওরাও ঘোষণা করেছে মানুষের স্বাশ্রয়ী সাফল্য ও সম্ভাবনার বাণী।

www.pathagar.com

মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার উপর এরা যেমন জোর দেয় তেমনি অপর দিকে ওরাও বলে, আধ্যাত্মিক সত্তার জন্যে তো একটা দেহাশ্রয়ও চাই।

দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্র ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূখন্ডের শিক্ষা-পদ্ধতিতেও নানারূপ আপাতবৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচ্য ভূখন্ডে ব্যক্তি মানুষের মুক্তির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে মানুষ এখানে জ্ঞানানুশীলন করে নিজে নিজে মোক্ষ লাভের উপায় হিসেবেই। প্রাচ্য চিন্তাধারায় ব্যষ্টিমুক্তির প্রাধান্য রয়েছে বলে অনেক ক্ষেত্রে সমষ্টি-কল্যাণ ও সমাজ-উন্নয়নের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয় না।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জগতে সমাজ-কল্যাণের উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এত বেশী দেওয়া হয় যে, এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে এক-নায়কবাদী সমাজ-ব্যবস্থাও গড়ে উঠতে দেখা যায়। সেখানে সমষ্টি-কল্যাণের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি-সত্তা বলি দেওয়া হয়।

আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে ক্রমেই পরস্পর সমীপবর্তী হচ্ছে তখন ব্যক্তি বা সমাজ সম্পর্কিত এককৌণিক মনোভঙ্গী পরিহার করে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে করে ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে। আধুনিক বিশ্বে শিক্ষার ভূমিকার গুরুত্ব এইখানে।

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে, ব্যক্তিসত্তা ও এর মাধ্যমে সমাজসত্তা বিকাশে শিক্ষা সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তিসত্তা যদি না পূর্ণায়বয়ব ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে ওঠে, সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না। এই কারণেই পূর্ণবিকশিত ব্যষ্টি সমবায়ে পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই হবে আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদ মনীষীদের উচিত এ বিষয়ে যথাযথ মনোনিবেশ করা।

সময়ে সময়ে একটা প্রশ্ন উঠেঃ শিক্ষা আমাদের লক্ষ্য অথবা লক্ষ্যে উত্তরণের উপলক্ষ মাত্র। সাধারণভাবে বলা যায়ঃ প্রাচ্য জগতে শিক্ষাকে মনে করা হয় চরম লক্ষ্য এবং পাশ্চাত্য জগতে লক্ষ্যে উত্তরণের উপলক্ষ।

শিক্ষাকে যদি উপলক্ষ্য বলেই মনে করা হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠেঃ শিক্ষার মূল লক্ষ্য বস্তুটি কি?

এর জবাবে প্রায়শঃ পাশ্চাত্য জগত বলে, সমাজ-কল্যাণই শিক্ষার লক্ষ্য।

www.pathagar.com

কিন্তু সমাজ-কল্যাণ এমন এক প্রত্যয় যাকে নানাভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

যা হোক, শিক্ষাকে উপলক্ষ হিসেবে ধরে নিলে শিক্ষার মূল্যমান অবশ্য কিছুটা ক্ষুন্ন হয়-ই। এই কারণে আমি বলতে চাইঃ শিক্ষা সম্পর্কে প্রাচ্যের ধারণাই মূলতঃ ঠিক। শিক্ষার জন্যেই শিক্ষা—এইটুকু মেনে নিলে জ্ঞান জীবন-পথের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলেই স্বীকার করা হয়।

শিক্ষার গুরুত্ব অবশ্য কেউ অস্বীকার করে না। তবু শিক্ষার প্রকৃত মূল্য তখনই ঠিক বোঝা যাবে, যখন আমরা শিক্ষাকে ধরে নেই লক্ষ্য হিসেবে। এই স্বীকৃতির ফলে মানুষের মর্যাদাও বেড়ে যায় বহুগুণ। এই দিক দিয়ে আমি মনে করি, শিক্ষাকে লক্ষ্যে উত্তরণের উপলক্ষ মনে না করে মূল লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা উচিত।

মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, প্রাচ্যদর্শন বলেঃ মানুষ আল্লাহ্ থেকে সম্ভূত এবং আল্লাহ্র অনন্ত গুণরাজি তার মাঝে বিধৃত, এই কারণে সমগ্র সৃষ্টির উপর মানুষ কর্তৃত্ব করতে পারে।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ধারণায়, মানুষ যদিও প্রগতিশীল পশু মাত্র, তবু বস্তুজগতে প্রগতির পথে তার অফুরন্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান। বিজ্ঞান-জগতে মানুষের বিস্ময়কর সাফল্য অপরাপর সৃষ্ট বস্তুর উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ এবং বিজ্ঞান বলেই জল-স্থল-অন্তরীক্ষের কর্তৃত্ব আজ মানুষের করতলগত।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য জগত মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা সম্পর্কে উদাসীন বলেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অভূতপূর্ব সাফল্য আজ মানুষেরই অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় প্রাচ্য দর্শনও আল্লাহ্ ও মানুষের নিকট-পরস্পর বুনিয়াদের উপর যদি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সাধনা দাঁড় করানো যায়, তাহলে বিজ্ঞান মানুষের ধ্বংসের হাতিয়ার না হয়ে সহসাই মানুষ সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও প্রগতির শ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠবে।

মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা সম্পর্কে প্রাচ্যের প্রত্যয় আর বস্তুজগতের ও পুগতির পথে অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা এ দুয়ের সমন্বয়েই হয়তো একদা সার্থক হয়ে উঠবে এ ধুলোর ধরায় মানুষের স্বর্গ রচনার চিরন্তন স্বপ্ন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা